কর্মস্থলের আদবকেতা

লেখক: মঞ্জুরুল আলম | প্রকাশিত: 13 September 2026, 04:44 PM | বিভাগ: এইচআরএম

কর্মস্থলে একজন নির্বাহীর আচরণ কেমন হবে? এক কথায় বলা যেতে পারে তাঁর আচরণ হবে প্রফেশনাল। সংক্ষেপে এভাবে আচরণকে প্রকাশ করলেও আসলে এর গভীরতা অনেক বেশি। আমার দৃষ্টিতে একজন নির্বাহীকে তিনটি জায়গায় তাঁর আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে হয়। প্রথমত, সহকর্মীদের প্রতি। দ্বিতীয়ত, যে দায়িত্ব নির্বাহীকে দেওয়া হয়েছে সেই দায়িত্বের প্রতি এবং তৃতীয়ত, রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের প্রতি। রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের মধ্যে আর্থিক, মানবসম্পদ, স্থায়ী সম্পদ সবই অন্তর্ভুক্ত। সহকর্মী আবার তিন প্রকার হতে পারে। ঊর্ধ্বতন নির্বাহী, সমকক্ষ নির্বাহী এবং অধীনস্থ নির্বাহী।

প্রথমেই আসা যাক কর্মস্থলে একজন জুনিয়র এক্সিকিউটিভ কেমন আচরণ করবে। কর্মস্থলে তাঁর প্রধান আচরণ হবে কাজ শেখার প্রতি মনোযোগ প্রদান করা। যে কোনো মূল্যে তিনি কাজ শিখতে ইচ্ছুক এই মনোভাব তাঁকে প্রমাণ করতে হবে। কিন্তু তাঁকে কে কাজ শেখাবে? কাজ শিখতে হয়

প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র বসদের নিকট থেকে। প্রত্যেকেই তাঁর নিজ নিজ কাজ নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু এরপরও তাঁরা কাজ শেখাতে উদগ্রীব থাকেন যদি জুনিয়রের মধ্যে কিছু গুণাবলী খুঁজে পান। যদি জুনিয়রের মধ্যে কাজ শেখার কোনো অদম্য ইচ্ছা দেখতে পান, সিনিয়রদের সম্মান করার মানসিকতা খুঁজে পান, প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন মেনে চলার প্রবণতা দেখতে পান, প্রতিষ্ঠানে নিজের সততার প্রমাণ দেখাতে পারেন, অহেতুক কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করার চেষ্টা না করেন এবং নিজের সুন্দর ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করতে পারেন। এই বিষয়গুলো থাকলেই একজন জুনিয়র যে কোনো সিনিয়রের মন জয় করে কাজ শেখার ক্ষেত্রটি তৈরি করতে পারেন। যেহেতু একজন জুনিয়র শুরুতে ফ্রেশ থাকে তাই তাঁকে এভাবেই নিজেকে প্রতিষ্ঠানের জন্য অপরিহার্য প্রমাণ করতে হবে। অপ্রিয় হলেও সত্য, অনেক প্রতিষ্ঠান জুনিয়রদের নিকট থেকে এই আচরণগুলো খুঁজে পায় না। তখন প্রতিষ্ঠান যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তেমনি সেই জুনিয়রেরও ক্যারিয়ার ঠিক মতো গড়ে তোলা সম্ভব হয় না।

যাঁরা ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন কর্মস্থলে তাঁদের আচরণ কেমন হওয়া প্রয়োজন। এখানে শুরুতেই যে বিষয়টি বলা প্রয়োজন তা হলো একজন ম্যানেজার মানেই তাঁর অধীনে কিছু কর্মী কাজ করবে। আমি অনেক সময় বলে থাকি একজন ম্যানেজার মানেই তাঁর মধ্যে তিনটি গুণাবলী থাকতে হবে। এই তিনটি গুণাবলীকে আমি সংক্ষেপে “থ্রি এ” দিয়ে বুঝিয়ে থাকি। এগুলো হলো অ্যাসেসমেন্ট, অ্যাক্সেস এবং অ্যাক্সেপ্টেবিলিটি। আমি মনে করি কর্মস্থলে আমি এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে বা কারও ওপর চাপিয়ে না দিয়ে সকলকে আগে অ্যাসেস করা প্রয়োজন। ম্যানেজার তাঁর টিমের সদস্যদের সাথে কথা বললে বুঝতে পারবেন কে কোন কাজটি সঠিকভাবে সম্পাদন করতে পারবেন। কার মধ্যে কী ধরনের যোগ্যতা রয়েছে তা তিনি আলোচনা না করে বুঝতে পারবেন না। যে কোনো কাজের সাফল্য নির্ভর করে টিমওয়ার্কের ওপর। ভয় দেখিয়ে বা তিরস্কার করে ভালো ফল পাওয়া যায় না তা অনেক আগেই প্রমাণ হয়ে গেছে। তাই, ম্যানেজারের প্রথম কাজই হবে সকলের সাথে আলোচনা করার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া। ফলে, একজন ম্যানেজার তাঁর দলের প্রত্যেক সদস্য সম্পর্কেই স্পষ্ট ধারণা রাখতে পারবেন এবং তাঁদেরকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারবেন।

ম্যানেজারের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো তাঁর নিকট সকলের আগমন সহজ করে দেওয়া। তাঁর অধীনস্ত যে কোনো নির্বাহী যেন তাঁদের নতুন নতুন ভাবনা বা সমস্যাগুলো নিয়ে ম্যানেজারের নিকট সহজে আসতে পারেন তা নিশ্চিত করা। তাঁর টিমের সদস্যরা যদি তাঁর নিকট সহজে প্রবেশাধিকার না পান তাহলে নতুন ধারণা বা সমস্যা সম্পর্কে তিনি অবগত হতে পারবেন না যা তাঁর অগ্রগতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। তাঁর কাছে সহজে চলে আসার সুযোগ প্রদানই সকলের নিকট তাঁর গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করবে। ফলে, তিনি সকলকে নিয়ে সঠিকভাবে টিমওয়ার্ক করতে পারবেন। তখন প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়ে যাবে। কর্মীর নিকট থেকে কাজ আদায় করার জন্য সবসময় আর্থিক সুবিধার প্রয়োজন হয় না। একটি “থ্যাংক ইউ” দিয়েও অনেক বড় বড় কাজ আদায় করে নেওয়া যায়। অনেক সিনিয়র কর্মকর্তা জুনিয়রদের অবজ্ঞা করেন। এটি মোটেও ঠিক না। জুনিয়ররা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিনিয়রের চেয়েও বেশি জানতে

পারেন। কারণ, জুনিয়ররা সর্বশেষ সিলেবাস পড়ে আসেন। তাছাড়া তাঁরা টেকনিক্যালি অনেক সাউন্ড হয়। তাঁদের নিকট অনেক নতুন নতুন ধারণা থাকে। সিনিয়রের দায়িত্ব হলো জুনিয়রের সেই মেধাকে কাজে লাগানো।

অনেক প্রতিষ্ঠানে সমপর্যায়ের কর্মীদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক বজায় থাকে না। একে অপরকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন। যোগ্যতা দিয়ে সামনে এগোতে না পারলে অনৈতিক পথ বেছে নেওয়ার চেষ্টা করেন। আসলে এ ধরনের মনোভাব না রাখাই ভালো। এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে পারস্পরিক চিন্তাভাবনা সহজেই শেয়ার করা যায়। প্রত্যেকেই নিজেকে আরও জ্ঞানগর্ভ করার সুযোগ পায়। ফলে, বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যেমন তাঁদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। আবার প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করলেও সেখানে তাঁদের গুরুত্ব আরও বেশি বৃদ্ধি পায়। সকলের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে কাজ করতে পারলে নিজের লাভের অংশটা বড়ই হয়। আর কোনো প্রকার দ্বন্দ্ব বজায় রাখলে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয় না। প্রতিষ্ঠান প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করতে পারে না। তখন নিজেদের প্রত্যাশিত অগ্রগতি হয় না, বরং ক্ষতিটাই বেশি হয়।

একজন নির্বাহীকে সবসময় প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুনগুলো মেনে চলা উচিত। কোনো ড্রেস কোড থাকলে তা যথাযথভাবে মেনে চলা প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানে কখনো উত্তেজিত হওয়া উচিত নয়। প্রতিষ্ঠানের সুনাম নষ্ট হতে পারে এমন কোনো কাজ করা ঠিক না। প্রতিষ্ঠানে কোনো কিছু গোপন করা ঠিক না। চেইন অব কমান্ড মেনে চলা প্রয়োজন। অভ্যাসগত দেরি করার মনমানসিকতা রাখা ঠিক না। সততা বজায় রাখা প্রয়োজন। অর্পিত ক্ষমতাকে নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করা উচিত না। মূলত এ বিষয়গুলো একজন নির্বাহীকে তাঁর কর্মস্থলে বিবেচনা করেই কাজ করা উচিত।

(চলবে)

© 2026 আপনার নিউজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
এই প্রতিবেদনটি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।